শিক্ষায় 'মাতৃভাষা' কথাটার অর্থ, অবস্থান ও ভবিতব্য
(নতুন ভারতীয় শিক্ষানীতির পরিপ্রেক্ষিতে পুনর্বিচার)

পবিত্র সরকার

১. পাঠকদের উদ্দেশ্যে দু-কথা

এই লেখার পরিপ্রেক্ষিত হল ভারতে ২০২০-তে একটি নতুন শিক্ষানীতির প্রচার। তাকে প্রথমে আমরা একটি খসড়া বা draft আকারে পাই ২০১৯-এ, পরে ২০২০-তে একটি Policy হিসেবেই পেয়ে যাই। আমরা এই নিবন্ধের প্রাথমিক আলোচনা মূলত এর ভাষা-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এর একটি তাত্ত্বিক অংশ আছে, সেই অংশটি সকলকে গুরুত্ব দিয়ে পড়তে অনুরোধ করব। সেটি এ প্রবন্ধের ৩ ও ৪ সংখ্যাত অংশে আশ্রিত। তার মূল প্রশ্ন দুটি শিক্ষায় মাতৃভাষা ঠিক কাকে বলব (৩), আর (৪) সেই এলাকায় মাতৃভাষার ভূমিকা শিক্ষায় কতদূর আর কীভাবে বিস্তারিত হবে। নতুন শিক্ষাপ্রস্তাবের আলোচনাকে ভিত্তি করে, আমরা চাই—এই প্রসঙ্গটা আবার তীব্রভাবে আলোচিত হোক। যেহেতু বাংলায় লিখেছি, সেহেতু এর প্রাথমিক লক্ষ্য বাংলাভাষীরা, মূলত পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের। অন্যেরা নিশ্চয় নিজেদের কথা নিজেরা ভাববেন। কখনও কখনও ভাষার লঘুতার এবং অনাচারিকতার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী, তবে মূলত এটি একটি জ্ঞানজিজ্ঞাসাভিত্তিক প্রবন্ধ।

২. ভারতের নতুন শিক্ষাপ্রস্তাব বিপুল উচ্ছ্বাস আর 'ভাসা-ভাসা' ভাষাবোধ

এর আগেকার ২০১৯-এ তার যে খসড়া প্রচারিত হয়েছিল, সেটি ছিল আয়তনে অনেকটা বড়—৪৭৮ পৃষ্ঠার, মতো। প্রথমটি, আমাদের পাঠ, এক ভয়ংকর 'সোডার মতো ভসভসিয়ে' ওঠা উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ ছিল। ভাবখানা এমন ছিল যে, 'ভাইসব, এ শিক্ষানীতির খসড়া করেই আমরা একটা সাংঘাতিক বিপ্লব করে ফেলেছি দেশে, বা বিশ্বভুবন জয় করে ফেললাম, আর কোনও কিছুর প্রয়োজন নেই, এবার রাতারাতি চেহারা আপাদমস্তক বদলে যাবে।' ইংরেজিতে যাকে euphoric বা triumphalist বলে, সেই রকম ভাষা যেন। লৌকিক একটা শব্দ হল gushy! তা সাড়ম্বরে বলছে, 'নাও, দিলাম তোমাদের এক পিস শিক্ষানীতি, এবার দুহাত তুলে নেত্ত করো!' ২০২০-র বাষট্টি পৃষ্ঠার চূড়ান্ত বইটিতে এই ফেনায়িত উচ্ছ্বাসের প্রকোপ একটু কমেছে। এত মামুলি কথা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে খসড়াটিতে বলেছিল ওই কমিটি যে, পরে নিশ্চয়ই তার সদস্যদের চৈতন্য হয়েছে, তাই খসড়ার ৪৭৮ পৃষ্ঠা শেষ পর্যন্ত ৬২ পৃষ্ঠায় দাঁড়িয়েছে। এতে কমিটি নিজেই প্রমাণ করল যে খসড়াটি অনেক অযথা বাগাড়ম্বরে পরিপূর্ণ ছিল। যিনি খসড়াটি লিখেছিলেন সেই অজ্ঞাতনামাকে দায়ী করাই যায়, কিন্তু কমিটির অধ্যক্ষ আর অন্যান্যরা নিশ্চয়ই সেটি দেখেই অনুমোদন করেছিলেন। আমাদের ছেলেবেলায় শিক্ষক বলতেন যে, যদি দেখিস পরীক্ষায় জুতমতো প্রশ্ন আসেনি তা হলে একটু 'ভাষা দিয়ে' লিখে পাতা ভরিয়ে আসবি, খবরদার কিছু ছেড়ে আসবি না।' খসড়া রচনার বেলায় কমিটি মনে হয় সেই কথাটা মনে রেখেছিল। তবে এও ঠিক যে চূড়ান্ত নীতির (২০২০) পুস্তিকাতে এই উচ্ছ্বাস অনেকটা সংযত হয়েছে।

এই শিক্ষানীতি নিয়ে এখন নানা স্তরেই আলোচনা হচ্ছে, আমরা তার সবটা নিয়ে আলোচনা করব না। এই পরিসরটুকু আমরা বেছে নিয়েছি শুধু শিক্ষায় 'ভাষা' সম্বন্ধে যে সব কথা আছে সেগুলির আলোচনা করব বলে। শিক্ষানীতির খসড়া আর শিক্ষানীতিটি সামনে নিয়ে দেখি যে ভাষা সম্বন্ধে যে সব কথা কমিটি বলেছে ('বলেছেন' লিখব কি?) তাতে ভাষা সম্বন্ধে তাঁদের অতিশয় 'ভাসা-ভাসা' ধারণার পরিচয় ফুটে উঠেছে। লক্ষ করে দেখলাম যে, কমিটিতে চেনা কোনও ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞানীর নাম নেই। ফারসি ভাষার বিশেষজ্ঞ আছেন বটে, আর অন্যদের ভাষা সম্বন্ধে ধারণার কোনও অনুমান তাঁদের পরিচয় থেকে করার উপায় নেই। কিন্তু ভাষা সম্বন্ধে নানা প্রাথমিক ধারণার অভাব এই খসড়া আর চূড়ান্ত প্রস্তাবে ফুটে উঠেছে, তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু সেটাও বড় কথা নয়। আমরা নিছক সমালোচনার জন্য এখানে কলম ধরছি না। বরং এই নব্য শিক্ষানীতির অন্তর্গত ভাষানীতি আমাদের কাছে একটা সুযোগ এনে দিয়েছে। এই নীতিতে শিক্ষায় মাতৃভাষার সম্ভাব্য ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু কথা বলা হয়েছে, সেই সঙ্গে স্কুলের নানা স্তরে অন্য ভাষা শেখানোর কথাও বলা হয়েছে। এগুলিই হবে আমাদের জল্পনার ভিত্তি। এই সব সূত্র ধরে আমরা এই উপমহাদেশে দীর্ঘদিন ধরে আলোচিত এবং অসমাপ্ত শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান কী এবং কতটা হওয়া উচিত সেই ব্যাপকতার প্রসঙ্গ আর একবার পুনরীক্ষণ করব, যাতে এ সম্বন্ধে যাঁরা ভবিষ্যতে এই অঞ্চলে নীতি প্রণয়ন করবেন তাঁদের জন্য কিছু জিজ্ঞাসা এবং তার উত্তর থাকে। অর্থাৎ এই আলোচনা শুধু ভারতের কথা ভেবে নয়, বাংলাদেশ এবং উপনিবেশ-নিষ্ক্রান্ত অন্যান্য দেশের জন্যও এ প্রশ্নগুলি তোলা হচ্ছে।

৩. 'মাতৃভাষা' সম্বন্ধে আমাদের অস্পট ও বিভ্রান্ত ধারণা

এ সম্বন্ধে আমরা আগেও লিখেছি (সরকার, ২০১৩ ৩২২-৩৩১)। এই শিক্ষানীতির এ অংশটির প্রথম ভাগে আমার দেখব যে, Home Language/Mother Tongue —ঠেস দিয়ে ভাগ-করা এই দুটি কথা এঁরা শিক্ষার ক্ষেত্রে অবলীলাক্রমে ব্যবহার করে গেছেন (খসড়া 80 পৃ., চূড়ান্ত 13 পৃ.)। কিন্তু এই উপমহাদেশের বেশিরভাগ (উচ্চ ডিগ্রিধারী হোক, খাজা নিরক্ষর হোক) লোকের মতো শিক্ষার ক্ষেত্রে আসলে মাতৃভাষা বস্তুটি কী, ঘরের ভাষা আর মাতৃভাষার সম্পর্ক কী তা নিয়ে মাথা ঘামাননি। রবীন্দ্রনাথ গান্ধিজির মতো মহাপুরুষেরাও কিছুটা সরল বিশ্বাসে 'মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ' বন্ধটি উচ্চারণ করে গেছেন, এবং প্রবল ব্যাকুলতায় মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষে আন্দোলন করেছেন, কিন্তু 'মাতৃভাষা' কথাটার নানা অর্থ নিয়ে বিচলিত হননি। কারণ সেই সময়ে ভাষাবিজ্ঞানও হয়তো তাঁদের কাছে এ ধরনের কোনও পরিচ্ছন্ন ধারণা নিয়ে হাজির হয়নি। কিন্তু এখন যে কোনও ভাষাবিজ্ঞানীকে জিজ্ঞেস করলেই নব্য শিক্ষানীতির প্রণেতারা এ সম্বন্ধে একটু পরিশীলিত ধারণায় হাজির হতে পারতেন। চূড়ান্ত তালিকায় আবার চারটি বিকল্প দেওয়া হয়েছে—home language/mother tongue/local Language/regional language. এর সমস্যা সম্বন্ধে আমরা পরে বলছি।

৩.১ আসল মাতৃভাষা কী ভাষাবিজ্ঞানের ধারণা

'মাতৃভাষা' কথাটা ভাষাবিজ্ঞানে সাধারণভাবে সেই ভাষা

বোঝাতে ব্যবহৃত হয় যেটা শিশু তার বাড়িতে বা আশ্রয়ে একেবারে জন্মের পরেই শেখে, তার জন্মদাত্রী বা পালনকর্তার (Caregiver, মায়ের অবর্তমানে) কাছ থেকে। ভাষাবিজ্ঞানে সেটাকে বলে প্রথম ভাষা বা Language 1 (language one)। এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিশুর ঘরের (গ্রামের/অঞ্চলের) এবং শিশু যে শ্রেণিতে জন্মেছে তার ভাষা। আমরা সবাই জানি যে অঞ্চল অনুযায়ী ভাষার তফাত হয়, সেই ভাষারূপকে বলে আঞ্চলিক উপভাষা বা dialect, আবার সেই সঙ্গে শিশু যে ঘরে জন্মায় সেই ঘরের মানুষদের বিত্ত, শিক্ষা, সংস্কৃতি অনুযায়ীও ভাষার তফাত হয়, তাকে বলা হয় শ্রেণিভাষা বা sociolect । এই উপভাষা আর শ্রেণিভাষার মিলিত রূপ (গাণিতিক পরিভাষায় intersection) হল শিশুর প্রথম ভাষা বা ঘরের ভাষা অর্থাৎ ভাষাবিজ্ঞানে home language আর মাতৃভাষায় কোনও তফাত নেই, দুয়ের মধ্যে মনের সুখে ঠেসদাঁড়ি দেওয়ার কোনও যুক্তি নেই।

এই প্রথম ভাষা বা আসল মাতৃভাষার বৈশিষ্ট্য হল, তা শিশু সচেতনভাবে শেখে না, 'ভাষা শিখছি' বলে তার বোধও হয় না। এটা তার শারীরিক, বৌদ্ধিক আর মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের অঙ্গ, ফলে সে যেমন ক্রমে হামাগুলি থেকে উঠে দাঁড়াতে শেখে তেমনই সে তার প্রথম ভাষাটিকেও শেখে। চমস্কি প্রমুখ ভাষবিজ্ঞানীরা একে বলেন acquisition এবং প্রত্যেক স্বাভাবিক মানবশিশু অন্তত একটি ভাষা/উপভাষা, এভাবে শেখার মস্তিষ্কনিহিত ক্ষমতা নিয়ে আসে। সে ভাষাটা শেখে শুনে শুনে এবং বলে বলে, এবং তার এটা শিখতে ব্যাকরণের নিয়ম জানার দরকার পড়ে না। অনেক সময়ে পড়তে শেখার আগেই সে ভাষাটা বলতে শিখে যায়। একটা বয়স পর্যন্ত, মোটামুটিভাবে বয়ঃসন্ধির আগে পর্যন্ত, যদি সে বলবার আর শোনবার যথেষ্ট সুযোগ পায় তবে সে একাধিক ভাষাউপভাষাও অনর্গল বলতে শিখতে পারে।

মনে রাখতে হবে, শিশুর এই ভাষাশিক্ষার স্বাভাবিক, কিন্তু সময়বদ্ধ এক ক্ষমতা। তা তার লিখতে-পড়তে শেখার ক্ষেত্রে খাটে না। সেখানে অনেকটাই বসিয়ে শেখানো বা tutoring দরকার হয়।

৩.২ আসল মাতৃভাষা বা প্রথম ভাষা/উপভাষা কিন্তু তার শিক্ষার ভাষা নয়

এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শিশুর এই ঘরের ভাষা=মাতৃভাষা (ধরা যাক পুরুলিয়ার চাষিপরিবারের মেয়ের প্রথম ভাষা বা চট্টগ্রামের মালভূমি অঞ্চলের শিশুর ভাষা), কিন্তু কখনোই তার স্কুলশিক্ষার ভাষা নয়। হওয়ার কথাও নয়। কারণ সব ঘর-শ্রেণির ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের সাধ্যে কুলোয় না, কুলোলেও তা বাস্তবসম্মত হত কি না সন্দেহ। এর যুক্তি আমরা নীচে একটু পরে রাখার চেষ্টা করছি।

তা হলে এই সব এবং এ রকম অনেক শিশুর শিক্ষায় যে ভাষা ব্যবহার হয় সেটা কোন ভাষা? সেটা হল, ওই শিশুর, এবং পুরুলিয়া থেকে সিলেট ও চট্টগ্রাম, দার্জিলিং থেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বা খুলনা পর্যন্ত শিশুর—সমস্ত অঞ্চলের সমস্ত শ্রেণির বাঙালি শিশুর যে গোটা বাংলা ভাষা, তার একটা নির্দিষ্ট রূপ, যার নাম প্রমিত বাংলা বা Standard Colloquial Bengali, সেইটা ব্যবহৃত হচ্ছে তার শিক্ষায়। একেবারে প্রথম থেকে ক্লাসে শিক্ষকেরা সাধারণভাবে ব্যবহার করছেন এই প্রমিত বাংলারই মৌখিক রূপ, এবং লিখিত রূপ। কারণ তার পাঠ্যবইগুলি এই প্রমিত বাংলাতেই লেখা। স্কুলে গেলেই সে শিশুকে নিজের ঘরের ভাষা থেকে প্রমিত বাংলায় পৌঁছাতে হয়। তাকে দুটো নতুন জিনিস আয়ত্ত করতে হয়। এক, মান্যচলিত বা প্রমিতের মৌখিক রূপ তাকে বলতে শিখতে হয়, এবং দুই, তার লিখিত রূপও তাকে লিখতে আর পড়তে শিখতে হয়।

পৃথিবীর সব ভাষাতেই এটা ঘটে। শিশুর 'মাতৃভাষা' অনেক সময় এক কিন্তু স্কুলে তাকে আর-একটা (উপ-) ভাষায় লেখাপড়া শিখতে হয়। তার কারণটা পরিষ্কার। 'ভাষা' বলতে আমরা সাধারণ, এমনকি ডিগ্রিওয়ালা পণ্ডিত লোকেরাও সাধারণভাবে একটা অখণ্ড সংহত, অবিমিশ্র রূপ বুঝি, কিন্তু কোনও ভাষাই তা নয়। তা আসলে উপরে যেমন বলা হয়েছে, বহু উপভাষার আর শ্রেণিভাষার একটা গুচ্ছ। এই গুচ্ছের মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠে তার একটা রূপ, যাকে বলা যায় Super dia-sociolect, বা প্রমুখ উপ-শ্রেণি-ভষা, বাংলার ক্ষেত্রে যা হল প্রমিত বা মানা চলিত বাংলা। সেটাই সাধারণভাবে হয় বাংলাভাষী অঞ্চলে বাঙালি শিশুর শিক্ষার ভাষা।

অন্য উপ-শ্রেণি ভাষার সঙ্গে তার তফাত কী? একটি গুরুত্বপূর্ণ তফাত হল, এক, এই প্রমিত বা মান্য বাংলারই মূলত মৌখিক আর লিখিত দু-রকম চেহারাই আছে। প্রমিত

ভাষা ছাড়া অন্য কোনও উপ-শ্রেণি ভাষারূপের নিয়মিত এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত লিখিত রূপ নেই। দুই, প্রমিত ভাষা মৌখিক রূপে বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষীদের (ধরা যাক মেদিনীপুরের মানুষের সঙ্গে নোয়াখালির মানুষের) পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তায়, ক্লাসে, বিদ্যার নানা আলোচনায়, বৈদ্যুতিন সংবাদ-মাধ্যমে, নানা আনুষ্ঠানিক বক্তৃতায় ব্যবহৃত হয়। আর লিখিত রূপে তা চিঠিপত্রে (এখন টেলিফোন আর ইন্টারনেট বার্তায়), সাহিত্যে, সংবাদপত্রে, অন্যান্য লেখায়, সরকারি আর বেসরকারি বিজ্ঞপ্তিতে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য উপ-শ্রেণিভাষা লেখায় ব্যবহার হতেই পারে, চরিত্রের সংলাপে, এমনকি সাহিত্য রচনায়, কিন্তু তা ভাষাগোষ্ঠীর নানা ভৌগোলিক প্রান্তের সকলের মধ্যে মূল আদান-প্রদানের মাধ্যম কখনও হয় না। বাংলাদেশ রাষ্ট্রে স্থানীয় উপভাষায় রেডিয়ো-টেলিভিশনের সংবাদ প্রচারিত হতেই পারে, কিন্তু তা মূলত ওই উপভাষা-গোষ্ঠীর জন্যই।

তাই, সূক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে এই প্রমিত ভাষা ভাষাগোষ্ঠীর অধিকাংশ শিশুর 'মাতৃভাষা' বা প্রথম ভাষা নয়। আমাদের মহাপুরুষেরা 'মাতৃভাষা' কথাটিকে এই ব্যাপক অর্থেই ধরেছেন, ভাষাবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নিয়ে তাঁদের মাথা ঘামানোর কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ বা মহাত্মা গান্ধির সময়ে এই ধারণাগুলির এমন মাজাঘষাও হয়নি। এমনকি, আমরা অন্যত্র বলেওছি, নানা জায়গায় 'মাতৃভাষার জন্য' যাঁরা শহিদ হয়েছেন—সে ঢাকা, শিলচর বা মাদ্রাজ প্রদেশ, বা অন্যত্র—পৃথিবীর যেখানেই হোক—তাঁরাও কিন্তু তাঁদের ঘরের বা অঞ্চলের উপভাষার জন্য প্রাণ দেননি। দিয়েছেন প্রমিত ভাষার জন্য।

কিন্তু এখন যাঁরা শিক্ষার ভাষানীতি নির্ধারণ করবেন তাঁদের এই সূক্ষ্ম তফাতটা খেয়াল রাখা দরকার। যাদের ঘরের ভাষা প্রমিত ভাষার কাছাকাছি, ধরা যাক বাংলার ক্ষেত্রের নদিয়া, হুগলি, কলকাতার ছেলেমেয়েদের, তারা তো খানিকটা সুবিধে পায়। অন্যদের নিজেদের ঘরের ভাষা ছেড়ে প্রায় নতুন ভাষার মত এই প্রমিত ভাষা শিখতে হয়। তবে এও দেখা গেছে যে, প্রমিত ভাষীদের ওই সুবিধা তত গুরুত্বপূর্ণ বা বিঘ্নকর নয়, কারণ পরীক্ষার ফলে অপ্রমিতভাষীদের সাফল্য খুব কম নয়, বরং অনেক সময় বেশি। তার কারণ পরীক্ষায় সাফল্য শুধু মুখের ভাষার দক্ষতার উপর নির্ভর করে না। লিখিত ভাষার দক্ষতা একটা ভিন্ন সামর্থ্য, আমি মুখে প্রমিত বাংলার কাছাকাছি একটা ভাষা বলি বলে তা লেখাতেও আমি অন্যদের চেয়ে এগিয়ে যাব, এমন প্রায়ই হয় না। মুখে প্রমিত বলি বলেই আমি লেখার বানান, বাক্যগঠন, ভাষার শৈলীতে অন্যদের পিছনে ফেলে এগিয়ে থাকব,স্বতঃসিদ্ধভাবে এমন হওয়র কথা নয়।

তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমস্যাটা হয়তো যত বড় মনে করা হয় তত বড় নয়। এবং লেখাপড়ার বিস্তারে, সাহিত্যপাঠের ব্যাপ্তিতে, রেডিয়ো-টেলিভিশনের ব্যাপক ব্যবহারে, নাটকে সিনেমায় আবৃত্তি, গান, গল্পের সিডিতে—দূরদূরান্তের শিশুরাও এখন প্রমিত ভাষা শোনার সুযোগ পাচ্ছে, ফলে তাদের উপ-শ্রেণিভাষাই ক্রমশ বিলীন হওয়ার দিকে চলেছে। ছেলেমেয়েরা স্কুলের ভাষাকে ঘরে নিয়ে আসছে। তাতে একটা নতুন সমস্যা দেখা দিচ্ছে যে, উপভাষাগুলির মধ্যে বিপন্নতা দেখা দিচ্ছে। প্রায়ই স্কুলের ছেলেমেয়েরা নিজেদের ঘরের ভাষাকে মনে করছে 'অশুদ্ধ' ভাষা, তাদের শিক্ষকেরাও অনেক সময় তাদের ধমকাচ্ছেন ক্লাসে 'অশুদ্ধ' ভাষা বলছে বলে। ১৯৬০-এর বছরগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কালো ছেলেমেয়েদের যেমন সাদা (কখনও কালোও) শিক্ষকেরা বকুনি দিতেন তার মান্য ইংরেজি বলছে না বলে, তেমনই অজস্র বাঙালি ছেলেমেয়েও নিশ্চয় এ রকম বকুনি খেয়েছে সে 'গেঁয়ো' ভাষা বলছে বলে। এই ধারণা আর এই বকুনি অন্যায় এবং অযৌক্তিক। ভাষাবিজ্ঞান ভাষার এই শুদ্ধ-অশুদ্ধ, জাত-বেজাতের বিচারকে স্বীকার করে না, তার মতে সব ভাষা এবং সব উপভাষার মর্যাদা সমান।

আর ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার হিসেবে বাংলাদেশ এই প্রমিত বাংলাকেই তারও নিজস্ব ব্যবহার্য ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছে। কালক্রমে যদি তার নিজস্ব একটি প্রমিত ভাষার দাবি ওঠে (হয়তো এখনই উঠছে), তখন সে দেশকে বিচার করতে হবে তার কোন উপভাষাটি সে দেশের মান্য বা প্রমিত ভাষা হবে। সে এক দীর্ঘ এবং দ্বন্দ্বময় প্রক্রিয়া। দ্বন্দ্ব শুধু বিভিন্ন উপভাষার নয়—সিলেট না চট্টগ্রাম না ঢাকা না রাজশাহির উপজশ্রেণি ভাষা সে সম্মান পাবে তার দ্বন্দ্ব (তবে সাধারণভাবে রাজধানীর এলিটদের ভাষাই প্রমিত ভাষা হয়ে থাকে)শুধু নয়—দ্বন্দ্ব হবে বর্তমানেরর সঙ্গে অতীতেরও। আগেকার বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পরের বাংলাদেশি সাহিত্যের ভাষার বিচ্ছেদ ঘটবে। তখন সে দেশের শিক্ষার 'মাতৃভাষা' ও ভিন্ন হয়ে যাবে।

সে ভবিষ্যতের জল্পনার কথা থাক। ওই যা হয়। সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা, এবং রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থা ভাষা উপভাষার জাতিভেদ তৈরি করতে বাধ্য হয়, তার কারণ, আগে যেমন বলেছি, সমস্ত উপ-শ্রেণিভাষায় শিক্ষা দেওয়া (পাঠ্যপুস্তক ছাপানো, শিক্ষা আর শিক্ষকের ব্যবস্থা করা, সংবাদমাধ্যম চালানো) রাষ্ট্রের সাধ্যের অতীত। আর তা উচিতও নয়, কারণ তাতে শুধু নানা রকমের ভাষাবিচ্ছেদ ঘটবে তা নয়, চাকুরিব্যবস্থাও বিপর্যস্ত হবে। পুরুলিয়ার ভাষায় এম এ পাশ ছেলে বা মেয়ে মালদাতে কাজ পাবে কি না সন্দেহ। আর শুধু উপভাষা নয়, অনেক ভাষা এতই ছোট, বা তার লোকজন এত নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে যে, তাদের জন্য তাদের ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা ভৌগোলিকভাবে যেমন, তেমনই অর্থনীতির দিক থেকেও সমস্যাপূর্ণ। কাজেই শিক্ষার বাহন যে প্রমিত ভাষা, তা mother tongue একটু প্রসারিত অর্থেই। তাই এই নিবন্ধে আমরা দুটি নতুন পরিভাষা ব্যবহার করতে চাইলে আমাদের মনে হয় স্কুলে শিক্ষায় প্রযুক্ত হয় প্রমিত ভাষার যে বিশিষ্ট রূপ তাকে **e-mother tongue** বললে ঘরের ভাষা থেকে আলাদা করা যায়। E হল education -এর সংক্ষেপ। বাংলায় বলতে পারি **শি-মাতৃভাষা**।

৪. 'মাতৃভাষা' মাধ্যম নিয়ে এই নীতিতে নানা নিরুত্তর

৪.১ সব ক্ষেত্রে মাতৃভাষার শিক্ষার সুযোগ থাকছে না।

আবার ভারতের নতুন শিক্ষানীতিতে ফিরে আসি। বোঝা গেল যে, ঘরের ভাষা শিক্ষার ভাষা—এই সব সূক্ষ্ম কচকচির মধ্যে না গিয়ে বা না বুঝে, শিক্ষানীতি নির্ধারকেরা ওই প্রমিত ভাষাকেই মাতৃভাষা হিসেবে ধরে নিয়েছেন। তবে তাঁরা local language/regional language -এর আরও দুটি বিকল্প রাখলেন কেন? আমাদের মনে হয় তাঁরা এই বিকল্পগুলি ভেবেছেন দু-রকম সম্ভাবনার বিবেচনায়। এক ছোট ভাষার কথা মনে রেখে। ধরা যাক, বাংলা, অসম বা ত্রিপুরার অনেক জায়গায় যে দীর্ঘস্থায়ী অভিবাসী সাঁওতাল জনগোষ্ঠী আছেন সংখ্যায় কম বলে তাঁদের শিশুদের (তাঁরা অনেকেই ভূমিপুত্র সেই অঞ্চলের) জন্য সব জায়গায় সাঁওতালিতে শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কারণ কোনও এক স্কুল-পশ্চাদভূমিতে তাঁরা একসঙ্গে যথেষ্ট সংখ্যায় থাকেন না, ফলে ক্লাসের জন্য যথেষ্ট ছাত্র পাওয়া যাবে না। হয়তো অন্যান্য অসুবিধেও (শিক্ষক না পাওয়া, পাঠ্যপুস্তক না থাকা ইত্যাদি) তাই সে অঞ্চলের বাইরে গিয়ে পড়বে, সেও অভিবাসীদের সমস্যা—বাঙালি শিশু, ধরা যাক, কর্ণাটকে, বা তামিল শিশু হরিয়ানায়—তাকে সম্ভবত স্থানীয় ভাষার মাধ্যমেই পড়তে হবে। পশ্চিমবঙ্গ এ ব্যাপারে তত কড়া না হলেও— এখানে অন্য ভাষার ছাত্রছাত্রী বাংলা না পড়েও শিক্ষায় এগিয়ে যেতে পারে—কিন্তু অন্যান্য অনেক প্রদেশ তাদের ভাষাপাঠকে আবশ্যিক করেছে। পশ্চিমবঙ্গ এ বিষয়ে পিছিয়ে আছে বলা যায়।

অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে, আর বিচ্ছিন্ন অন্য প্রদেশে প্রবাসী ভারতীয়ের পক্ষে নিজের শি-মাতৃভাষায় শেখার সুযোগ আর রইল না। তাই সব ক্ষেত্রে শি-মাতৃভাষার মাধ্যমে শেখার সুযোগ থাকছে না শিশুর। মাধ্যমের কথা ছেড়েই দিলাম, এমনকি বিষয় হিসেবেও শি-মাতৃভাষা শেখার সুযোগ সে পাচ্ছে না। ভারতের মতো বহুভাষী দেশে এমনটাই অনিবার্য ভেবে নীতিনির্দেশকরা এই বিকল্পের ব্যবস্থা রেখেছেন।

আমাদের মনে একটা অন্য ভাবনা উঁকি দিচ্ছে, সেটা এই কমিটির মনে হয়নি কেন জানি না। এ কমিটি 'ডিজিট্যাল' 'ডিজিট্যাল' করে চোখ উলটে বারে বারে মুচ্ছো গেছে, কিন্তু এই কথাটা তাঁদের মনে হয়নি যে, আজকের দিনে এরও একটা সমাধান বার করা সম্ভব। অর্থাৎ ভারতীয় শিশু যেখানেই থাকুক, সে সেখানেই তার মাতৃভাষায় শিক্ষা নিতে পারে। বেশি সংখ্যক থাকলে তো নিজেদের স্কুলই করতে পারে, যেটা এক সময় উত্তর ভারতে প্রচুর হয়েছিল। আমার কিশোরবেলায় বহুভাষী খড়গপুর শহরে হিন্দিভাষী, ওড়িয়াভাষী আর তেলুগুভাষীদের স্কুল দেখেছি। কিন্তু সেটা যেখানে সম্ভব নয় সেখানে অনলাইনে তার রাজ্যের সিলেবাস তাকে কোনওভাবে পড়ানো এবং পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা সম্ভব কি না, তা তাঁরা যাচাই করেননি। আমি বলছি না এটা একটা নিশ্চিদ্র ব্যবস্থা, কিন্তু এক সময় হয়তো সম্ভব বলে বিবেচিত হবে।

হাই হোক, এঁদের প্রস্তাবে শি -মাতৃভাষা মাধ্যমেরর গুণগান সত্ত্বেও এই হল প্রথম ফাঁকি যে, তাঁরা তার বিকল্পের সম্ভাবনাও রেখেছেন।

৪.২ ইংরেজি মাধ্যম সম্বন্ধে নৈঃশব্দ্য

আরও ফাঁকি আছে। ফাঁকি বা ফাঁক। আর একটা ফাঁকি হল ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলির বিষয়ে। সেখানে কোনও অঞ্চলেই শি-মাতৃভাষা মাধ্যম নয়। শি-মাতৃভাষা তার কোনও

স্কুলে একটি বিষয় হিসেবে পড়ানো হয়, কোথাও বা তাও হয় না। এলিট, এবং সমাজবিজ্ঞানে যাদের 'প্রোটো এলিট' (= এলিট হওয়ার দিকে এগোতে চায় যারা) বলা হয় সেই শ্রেণির অভিবাবকেরা নিজেদের ছেলেমেয়েদের ইংরেজি মাধ্যমে ক্রমশ বেশি বেশি ঠেলছেন, তার কারণ সংক্ষেপে এই যে, ইংরেজি হল 'সাংসারিক সাফল্যের ভাষা'। মাতৃভাষা তো বাড়িতেই বলে, ও আবার শেখার কী আছে? এবং এই নতুন শিক্ষানীতিপ্রণেতারা তার গায়ে হাত দেবার ব্যাপারে উচ্চবাচ্য করেননি। তা হলে তো আধিপত্যকারী শ্রেণির গায়ে হাত দিতে হবে, সেটা রাষ্ট্রের পক্ষে, বা রাষ্ট্রের এই প্রতিনিধিদের পক্ষে সম্ভব নয়।। কারণ রাষ্ট্রপরিচালনার লাগাম তাঁদেরই হাতে। হ্যাঁ, বলছেন যে সরকারি স্কুলগুলিতেও এই নীতি মান্য করা হবে। কিন্তু এখন যে সব স্কুলগুলিতে শি-মাতৃভাষা মাধ্যম নেই, সেগুলিকে মাতৃভাষা মাধ্যমে রূপান্তরিত করা হবে—এমন কোনও কথা নেই। এখানে স্পষ্ট একটা সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে সুবিধা হত।

আবার, যেখানে শিশুর মাতৃভাষা অঞ্চলের শিক্ষার ভাষা থেকে আলাদা, সেখানে শিক্ষকদের দ্বিভাষিক প্রকরণ (bilingual approach) গ্রহণ করতে বলা হচ্ছে। এ তো খুব ছেলেমানুষি ভাবনা! সেটা দুটি ভাষা পাশাপাশি বা একই অঞ্চলে বলা হলে তা কিছুটা সম্ভব। কিন্তু যে তেলুগু ছাত্র বা ছাত্রী গুজরাতে পড়বে, তার গুজরাতি শিক্ষক তেলুগু বলতে পারবেন তো? কমিটি তার ব্যবস্থা কীভাবে করবেন? এখানে কি ইংরেজি বা হিন্দিকে একটু এগিয়ে আনার চেষ্টা হচ্ছে? দ্বিতীয়, একজন দুজন বিচ্ছিন্ন ছাত্রছাত্রীর জন্যও কি ওই দ্বিভাষিক উপায়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে? সে প্রশ্নের বিচার আর উত্তর নেই।

তিন নম্বর ফাঁক বা ফাঁকি হল, কমিটি বলছে যে প্রথম কয়েক বছর (until att least Grade 5, but preferably till Grade 8. অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শি-মাতৃভাষা মাধ্যম হলে ভালো, সঙ্গে জোড়া হয়েছে and beyond—p. 13) এই and beyond কথাটির ব্যাখ্যা তাঁরা দেননি। দেওয়া উচিত ছিল এই জন্য যে তাঁদের vision তো মাত্র কয়েক বছরের নয়।

And beyond বলতে আমরা কী বুঝব? আমরা কি বুঝব যে, অনেক ক্ষেত্রে যেমন আছে, শি-মাতৃভাষায় ছাত্রছাত্রী অন্তত মানবিক বিদ্যায় এম এ এবং গবেষণার স্তর পর্যন্ত পৌঁছোতে পারে। সেটা চলবে তো? আমার জানি যে প্রযুক্তি, ডাক্তারি, ম্যানেজমেন্ট, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় এখন আমাদের ইংরেজিতেই পড়তে হয়। বিজ্ঞানে স্নাতক স্তরে কোথাও শি-মাতৃভাষায় পড়াশোনা অনুমোদিত, কিন্তু স্নাতকোত্তর স্তরে নয়। আর প্রযুক্তি ডাক্তারি, ম্যানেজমেন্ট এগুলিতে ইংরেজিই শিক্ষার মাধ্যম।[১]

And beyond বলতে কি আমরা বুঝব যে, উপরের সমস্ত শাখায় তাঁরা শি-মাতৃভাষার মাধ্যম প্রবর্তনের কথা ভাবছেন? আমাদের আশা অনেকের কাছে উন্মাদের প্রলাপ বলে মনেই হতে পারে। কিন্তু আমরা তো পৃথিবীর ইতিহাসে বা সভ্যতা-সংস্কৃতিতে অভাবিত, পূর্বদৃষ্টান্তহীন, অবিশ্বাস্য কোনও সম্ভাবনার কথা বলছি না! পৃথিবীর বহু বহু দেশ তো এটা করে! চিন, জাপান, রাশিয়া সহ ইউরোপের সমস্ত দেশ, দক্ষিণ আমেরিকার নানা দেশ তো শি-মাতৃভাষাতেই সব শেখায়। আমাদের এ রকম একটা ভবিষ্যতের কথা ভাবতে বাধা কোথায়, অন্তত সুদূর ভবিষ্যতে। এই কথাটা যে তাঁরা ভাবলেন না, সেটা আমার আর একটা ফাঁক বলে মনে হয়। যে কোনও প্রাক্তন উপনিবেশেরই এই কথা ভাবার সময় এসেছে যে, যে ভাষা তার শিক্ষার ভাষা তা তার সব রকম শিক্ষার ভাষা হতে পারে কি না, হলে কবে হবে এবং কীভাবে হবে। তার জন্য রাষ্ট্র কীভাবে অগ্রসর হবে সেই পরিকল্পনাও এখনই করা দরকার।

এই কথা বলা মাত্র বিপুল অট্টহাস্যের সঙ্গে যে প্রতিযুক্তিগুলি আমাদের প্রতি ধেয়ে আসবে সেগুলি আমরা জানি। না, আমরা কখনওই চাই না বা ঘৃণাক্ষরেও বলি না যে, আমাদের ছাত্রছাত্রীরা অন্য ভাষা শিখবে না। অন্তত ইংরেজি তারা নিশ্চয়ই শিখবে, আশা করি যথাসম্ভব ভালো করে শিখবে। পরে নীতিপ্রণেতাদের multilingualism and the power of language অংশের আলোচনায় আমরা আমাদের বক্তব্য খোলসা করব। কিন্তু বারতের প্রধানমন্ত্রী তো কথায় কথায় আত্মনির্ভরতার কথা বলেন, তা হলে শিক্ষায় ভাষামাধ্যমের ক্ষেত্রে আমরা আত্মনির্ভর হব না কেন, এবং তার জন্যে নিজেদের ভাষাগুলির পরিচর্যা শুরু করব না কেন? অর্থাৎ ধীরে ধীরে, ধাপে ধীপে, মানবিক ছাড়া অন্যান্য বিদ্যার নানা শাখায়, ইংরেজিকে সরিয়ে আমরা আমাদের শি-মাতৃভাষাকে এগিয়ে দেব। সেটা করব কীভাবে, কখন? কীভাবে পাঠ্যবই,

ভাষাপাঠ বা রেফারেন্স বই, পরিভাষা তৈরি করব / অনুবাদ করব, ক্লাসে পড়াব, পরীক্ষা নেব ইত্যাদি পরিকল্পনা। অনেক বিদ্যার ক্ষেত্রেই ইংরেজির পাঠ পাশাপাশি চলবে, ভাষাপাঠ্যে ইংরেজির গুরুত্বপূর্ণ জায়গা থাকবে, কিন্তু শিক্ষায়তনে প্রত্যক্ষ বিদ্যার আদান-প্রদান চলবে শি-মাতৃবাষায়। অর্থাৎ পড়া, পড়ানো, পরীক্ষা দেওয়া/নেওয়া, এবং বিদ্যার আলোচনা—এই মূল ক্ষেত্রগুলিতে শি-মাতৃভাষাকে নিয়ে আসতে হবে।

আমাদের ভাষাগুলি তার যোগ্য হয়ে ওঠেনি—এ একটা ছেঁদো যুক্তি। ভাষার ঘাড়ে দোষ দেওয়া হাস্যকর, ভাষা নিজে যোগ্য বা অযোগ্য হতে পারে না। আমরা চাইনি বলেই আমাদের ভাষা যোগ্য হয়নি। চাইলেই তা আস্তে আস্তে যোগ্য হয়ে উঠবে। পৃথিবীর কোনও ভাষাই জন্মেই উচ্চশিক্ষার ভাষা হয়ে উঠতে পারে না, তাকে দীর্ঘদিন ধরে সযত্নে প্রস্তুত করতে হয়। ইংরেজির উপর অতিরিক্ত নির্ভরতার কারণে আমাদের ভাষাকে আমরা নিজেরাই খর্ব করে রেখেছি। তা যতটা আবেগ বা কল্পনা প্রকাশের ভাষা হয়ে আছে, যতটা কবিতা, নাটক, গল্প-উপন্যাসের ভাষা হয়ে আছে ততটা মননশীল আলোচনার ভাষা হয়নি। তার একটা কারণ আমাদের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত আর খ্যাতনামা দেশি বুদ্ধিজীবীরা বাংলায় বা ভারতীয় ভাষায় তাদের গবেষণার কথা লেখেন না। প্রতমে সহজভাবে লিখে বিষয়টি সম্বন্ধে বাঙালি পাঠককে প্রাথমিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে। পরে ধীরে ধীরে তাঁর গবেষণার সূক্ষ্ম দিকও পাঠক বুঝতে পারবেন কারণ তাঁর মাতৃভাষাই ততদিনে উচ্চবিদ্যা দানের উপযুক্ত হয়েছে। আমার মনে হয়, বাংলাদেশ শি-মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ভারতের চেয়ে কিছুটা এগিয়ে আছে। কিন্তু মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ পেলে দেশে শিক্ষার বিস্তার কীভাবে হয় তা বোঝানোর জন্য আমরা ভারতের সাক্ষরতার দশকওয়ারির খতিয়ানটি একবার দেখে নিই—

<u>ইংরেজি-মাধ্যম পর্ব সাক্ষরের শতাংশের হিসেব</u>

১৮৭২ ৩.৭৫

১৮৮১ ৪.৩২

১৮৯১ ৪.৬২

১৯০১ ৫.৪

১৯১১ ৫.৯

১৯২১ ৭.২

১৯৩১ ৯.৫

<u>১৯২৯-এ বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুলে মাতৃভাষা মাধ্যম চালু হলে, কলকাতায় ১৯৪০ থেকে</u>

১৯৪১ ১৬.১

১৯৫১ ১৮.৩৩

১৯৬১ ২৮.৩

১৯৭১ ৩৪.৪৫

১৯৮১ ৪৩.৫৭

১৯৯১ ৫৩.২১

২০০১ ৬৪.৮৩

২০১১ ৭৪.০৪

২০২০ (নমুনা সমীক্ষা) ৭৭.৭

গত ন-বছরেই আমাদের অগ্রগতি বেশ কম। তাই যে সরকার এই ন-বছরে মাত্র তিন শতাংশের মতো মানুষকে সাক্ষর করতে পেরেছে, তার এই অতি বিস্তারিত আর অতি বিস্ফারিত শিক্ষানীতি মোটামুটি বিস্ময় আর অবিশ্বাস জাগায়। যাই হোক, লক্ষ করবেন, মাতৃভাষায় স্কুলশিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ার পর কীভাবে সাক্ষরতার পরিমাণ ধাপে ধাপে বেড়েছে। ১৯৫১ পর্যন্ত দশকে বৃদ্ধির গড়, আর ১৯৫১ থেকে দশকে বৃদ্ধির গড় থেকেই একটা স্পষ্ট ছবি পাওয়া যাবে। হয়তো মাতৃভাষায় শিক্ষাই একমাত্র কারণ নয়, কিন্তু তা কোনও কারণ নয় তা বলাটা যুক্তিতে আসে না।

৫. ইংরেজি পাশাপাশি শিখতেই হবে, কিন্তু মাধ্যম হিসেবে নয় দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে

আবার বলি, আমাদের শিক্ষায় ইংরেজির খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান থাকবে, কারণ ইংরেজি এখন বিশ্বে নানা ক্ষেত্রে জরুরি ভাষা। তবে তার জন্য ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা দরকার, এ কথার কোনও তাত্ত্বিক ভিত্তি নেই। যতদূর সম্ভব, যতভাবে সম্ভব, মাতৃভাষায় শিক্ষার কথা ভাববার সময় এসেছে। সেই সঙ্গে ইংরেজি এমনভাবে শেখাতে হবে যাতে সেটিও সকলে লেখায় এবং অনুবাদে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারে, বলাতে যেমনই হোক। আমরা নীরদ চৌধুরীর ইংরেজি শুনেছি, তিনি পুরোপুরি

ভারতীয় বা বাঙালির ধরনে ইংরেজি বলতেন, তাতে তাঁর সম্ভ্রমের এতটুকু হানি হয়নি।

তাই শি-মাতৃভাষা নিয়ে নতুন ভারতীয় শিক্ষানীতি নির্ধারকদের কথাবার্তায় একাধিক ফাঁকি আমাদের চোখে পড়েছে।

৫.১ স্কুলে অন্তত পাঁচটি ভাষা শেখার অবিশ্বাস্য বোঝা

কোনও 'উন্নত' দেশেও যেটা সাহস করে বলে না, সেটা এঁরা বলেছেন। এঁরা বারো ক্লাসের মধ্যে পাঁচটি ভাষা শেখার সুপারিশ করেছেন। ২০২০-এর পুস্তিকার 4.11 অংশে এই সমিতি স্কুলে একাধিক ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে যা বলেছেন (অন্তত পাঁচটি ভাষা বারো ক্লাসের মধ্যে শিখতে হবে) তা হাস্যকর রকমের অবাস্তব। প্রথমত তাঁরা যে বলেছেন (4.12) শিশুদের ২ থেকে ৮ বছর পর্যন্ত ভাষা শেখার ক্ষমতা বেশি থাকে তা দু-দিক থেকে ভুল। এক, শিশুদের ভাষাশিক্ষার বিশেষ সময় (ভাষাবিজ্ঞানে যাকে critical period বলে) তা এর চেয়ে দীর্ঘ। শিশুর ভাষা শিক্ষা প্রায় তার মায়েরর পেট থেকেই শুরু হয়, সে যখন মায়ের পেটে সাত মাসের তখন সে মায়ের কণ্ঠস্বরের ভাষাকে অন্যদের কণ্ঠস্বর থেকে আলাদা করতে পারে। আর জন্মের পর প্রথমে কান্না তার ভাষা; তার পর ছয় সপ্তাহ থেকে গলায় নানা "গ্‌গু' আওয়াজ শুরু হয়, যার নাম cooing পর্ব। তার পর কলধ্বনি বা babbling পর্ব, তা চলবে তার ছয়মাস বয়স পর্যন্ত। এর পরের দু মাসে তার কথায় intonation pattern বা সুর আসবে। তার পরে সে একশব্দের বাক্য বলতে শুরু করবে, আট মাস থেকে এক বছরের মধ্যে, ছ-মাস পরে, অর্থাৎ তার দেড় বছর বয়সে দুই শব্দের বাক্য বলবে। সবগুলি পর্যায় আমি বলছি না, ভাষবিজ্ঞানে এটা বলা হয় যে দশ বছর বয়সে স্বাভাবিক শিশুর পরিণত ভাষাদক্ষতা অর্জিত হয়।[২] শতকরা নিরেনব্বই জন মানুষের ভাষাশিক্ষার এই স্বাভাবিক শৈশব দক্ষতা নষ্ট হয় বয়ঃসন্ধির পরে। এই শুনে শুনে বলে বলে ভাষাশিক্ষার 'স্বাভাবিক' দক্ষতাকে ক্রাশেন নামে একজন তাত্ত্বিক ইংরেজিতে acquisition নাম দিয়েছেন।[৩] এটা সচেতন শিক্ষা নয়, এটা রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা তার উপর চাপিয়ে দিচ্ছে না, এটা প্রায় সে নিজের অজ্ঞাতসারে শিখছে। তাকে ব্যাকরণ জানতে হচ্ছে না, কিছু মুখস্থ করতে হচ্ছে না, হোমওয়ার্ক লিখে নিয়ে যেতে হচ্ছে না। পাঠকেরা এ ব্যাপারটা খেয়ালে রাখুন।

এই কথা উল্লেখ করে নীতিপ্রণেতারা যে দ্বিতীয় ভুলটি করেছেন তা হল ওই শ্রুতিকথন-নির্ভর ভাষাশিক্ষাকে স্কুলের ভাষাশিক্ষার সঙ্গে এক করে দেখা। এটা অজ্ঞতাজনিত হতে পারে, অতি উৎসাহের ফলে উপেক্ষাজনিতও হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে ইংরেজিপ্রেমীদের আন্দোলনে এর আগেও এই নির্বোধ উপেক্ষা বা অজ্ঞতা দেখা গেছে। ভাষাবিজ্ঞানীরা কোথাও এ কথা লুকোন না যে, শিশুর ওই ভাষা শিক্ষা আসলে শুনে শুনে আর বলতে বাধ্য হয়ে শিক্ষা, একটা মুখের ভাষা শিক্ষা। মুখের ভাষা শেখার সত্যই একটা বিস্ময়কর ক্ষমতা (ওই চমস্কি কথিত LAD) সব স্বাভাবিক শিশুর আছে, ওই জন্ম থেকে দশ বছর বয়সের মধ্যে। সে প্রথম শেখে মুখে মুখে, তার পাশাপাশি অন্য একাধিক ভাষাও সে শিখতে পারে মুখে শুনে শুনে এবং বলে বলে। এটা অনেক শিশুর ক্ষেত্রেই আমরা লক্ষ করি যে, তার বাড়িতে মা বাবার সঙ্গে একটা ভাষা বলছে, পাড়ার খেলার সঙ্গীদের (peer group) সঙ্গে আর একটা ভাষা বলছে, বাড়ির কাজের সহায়ক-সহায়িকাদের সঙ্গে আর-একটা ভাষা বলছে।

কিন্তু, এটা হল বলার দক্ষতা, সেটা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু যেটা শিক্ষাতত্ত্বের একটা বড় সত্য, স্কুলে শিশু শুধু মুখের ভাষাটা (= ঘরের ভাষা language-1) শেখে না। প্রথমত সে শেখে প্রমিত ভাষা, ওই আমরা যাকে বলি শি-মাতৃভাষা। সেটা সে নানা জায়গায় (টেলিভিশন, সিনেমা, নাটক) শোনে, অন্তত মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশু। কিন্তু সে তো স্কুলে মুখ্যভাবে সেটা বলতে শেখে না, শেখে পড়তে লিখতে।

আমাদের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে দ্বিতীয় ভাষা বঙ্গলাংশে ইংরেজি, এবং তাকে যারা ইংরেজি বলতে শেখান শতকরা ৯৯টি ক্ষেত্রে ইংরেজি তাঁদের মাতৃভাষা নয়, জন্মভাষাও নয়। আর তাই ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে যাইহোক, তার বাইরে শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি বলতে শেখা খুব আধাখ্যাচড়া রকমের হয়। এককালে তাকে 'বাবু ইংরেজি' বলা হয় এখনও সেই বাবু ইংরেজি আমরা শুনি। এখন সেটাকে 'ভারতীয় ইংরেজি' বলে একটু মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। আমাদের এ কথাটা অতিরঞ্জিত মনে হলেও খুব ভুল হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, স্কুলে আমরা ভারতীয় বা দক্ষিণ এশীয় ইংরেজি শেখানোর কথা ভাবি না, ব্রিটিশ বা এখন আমেরিকান প্রমিত ইংরেজি শেখানোর কথাই ভাবি।

কিন্তু যেটা বড় কথা, এই অঞ্চলে ইংরেজি যখন স্কুলের ভাষা হিসেবে আসে, তখন তা শোনার চেয়ে লিখতে হয় বেশি, এবং সেই লেখা শেখার কোনও জন্মগত ক্ষমতা শিশুর নেই। কানে শুনে শুনে বলতে শিখে গেলাম এক কথা, কিন্তু অন্য ভাষা বা ইংরেজি লেখা দেখলাম আর লিখতে শিখে গেলাম, এই অলৌকিক ব্যাপারটা শিশুর ক্ষেত্রে ঘটে না। আমাদের চেনা ইংরেজির ক্ষেত্রে তো এ সব প্রায়ই দেখি। শিশুকে বর্ণমালা শিখতে হয় (চেনা, ক্রম অনুসারে মুখস্থ করা, ঠিকঠাক লেখা—যেখানে b আর d কিংবা 'ল' আর 'শ' গুলিয়ে যেতে পারে), বানান শিখতে হয়, বাক্যে শব্দের ক্রম (বাংলার মতো নাও হতে পারে— বাংলায় ক্রিয়াপদ সাধারণভাবে শেষে বসে, ইংরেজিতে সাধারণভাবে কর্তার পরে) আর তার এদিক-ওদিক হওয়া (ইংরেজিতে এক ধরনের প্রশ্নে সহায়ক ক্রিয়াপদ do ইত্যাদি বাক্যের আগে আসে), উচ্চারণ আর ব্যাকরণেরর নিয়মকানুন শিখতে হয়, নতুন নতুন শব্দ লিখতে হয়। ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ছাড়া ক্লাসঘরে সে ইংরেজি ভাষা শোনার সুযোগ কম পায়, যদি না টেলিভিশন বা ইউটিউবের সাহায্য নেয়। ইংরেজি শোনা এবং ইংরেজি খবরের কাগজ বা 'বাইরের বই' পড়া তাকে সাহায্য করতে পারে। অন্য ভাষার ক্ষেত্রে এই পার্শ্বিক সহায়তা আরও দুর্লভ। কিন্তু মোদ্দা কথা এই— দুই থেকে আট বছরে শিশুর মৌখিক ভাষা শেখার প্রাকৃতিক দক্ষতা তার ভাষা লেখা শিখতে খুব কম সাহায্য করে। সেটা শিক্ষক আর অভিভাবকেরা জানেন, কারণ এসব শেখাতে তাঁদেরও গলদ্‌ঘর্ম হতে হয়, এবং তা সত্ত্বেও বানান ভুল এবং ইংরেজির অন্যান্য ভুল আমাদের সারা জীবন পশ্চাদ্ধাবন করে। আমি মনে করি শিশুর ওই প্রাকৃতিক দক্ষতার নজির ভারতীয় স্কুলের বিদেশি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে তোলা এক ধরনের মূঢ়তা।

আর এই সমিতি সেখানে কী করেছেন, না স্কুল পর্যায়েই ছাত্রছাত্রীদের পাঁচ-পাঁচটা ভাষা শেখার সুপারিশপত্র দিয়েছেন। যেমন 4.13 (p. 14) -তে দেখি ১৯৬৮-তে ঘোষিত ত্রিভাষা শেখানোর কথা বলা হয়েছে। তাতে অন্তত একটি ভাষা বিদেশি হবে—ধরে নিচ্ছি সেটা ইংরেজি— এমনই এঁদের মনের কথা। প্রথমদিকে ওই শি-মাতৃভাষা আর অন্য একটি ভাষা, আর ক্লাস সিক্স বা সেভেন থেকে তৃতীয় ভাষা, সম্ভবত ইংরেজি। তা হলে দাঁড়াল, ফাইভ পর্যন্ত দুটি ভাষা, আর সিক্স বা সেভেন থেকে ইংরেজি। এই তিনটি মোটামুটি 'বাধ্যতামূলক'। ওই তিন ভাষার মধ্যে সংস্কৃতও থাকতে পারে, খুব উচ্ছ্বসিত ভাবে এঁরা সে কথা বলেছেন (4.17) Sanskrit will be offered at all levels of school and higher education as an important, enriching option for students, including as an option in the three-language formula. যতক্ষণ তা option ততক্ষণ ঠিকই আছে, তা ছাত্রছাত্রীদের স্বাধীন নির্বাচন হবে। কিন্তু ত্রিভাষা সূত্রের মধ্যে এসে গেলে তা আর ঐচ্ছিক থাকবে না।

এর পরে (4.18) আসছে নব্য-ক্লাসিক্যাল ভাষাগুলির কথা। পাঠকেরা হয়তো জানেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার ২০০৫ থেকে কিছু কিছু ভারতীয় ভাষাকে 'ক্ল্যাসিক্যাল' এই নাম দিয়ে চলেছেন। এর মূলে একটা রাজনৈতিক অভিসন্ধি ছিল, দক্ষিণিদের তুষ্ট করা। তাতে নানা অদ্ভুত শর্ত আছে। একটা হল ভাষাটাকে অন্তত পনেরোশো বছরের প্রাচীন হতেই হবে। কেন দুহাজার বছর নয়, কেন পনেরোশো বছর—কোন যুক্তিতে, তা কেউ বলেনি। ফলে দক্ষিণ ভারতের একাধিক ভাষা চিহ্নিত হয়েছে এই 'নব্য-ক্লাসিক্যাল' তকমায়, আমাদের প্রতিবেশী ওড়িয়াও এই মর্যাদা পেয়েছে। এতে আশ্চর্যের কথা হল, সমগ্র বিশ্বে যা দীর্ঘদিন ধরে ক্লাসিক্যাল ভাষা হিসেবে গণ্য, সেই সংস্কৃতকে সে মর্যাদা দেওয়া হল তামিলের পরের বছর, ২০০৬-এ। এতে সরকারের চক্ষুলজ্জা হয়েছিল কি না জানি না।

কিছু ভাষাকে এইভাবে 'সিনিয়র সিটিজেনশিপ' পাইয়ে দেওয়ার যে রাজনীতি, তা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কিছু মানুষ নানা কারণেই ক্ষুব্ধ, কিন্তু আমাদের তার মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই। সমস্যা হল, এর পরে নীতি-সমিতি এই নব্য ক্লাসিক্যাল ভাষাগুলির (তামিল, মলয়ালম, তেলুগু, কন্নড়, ওড়িয়া শুধু নয়, পালি, প্রাকৃত আর ফারসিও) একটিকে পাঠ্যতালিকায় আনার সুপারিশ করেছেন। রক্ষা এই যে, এগুলির পাঠকে option হিসেবে, এবং online module হিসেবে রাখতে বলছেন। কারণটা অনুমান করা যায়—স্কুলে এত ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা (পাঠ্যবই ছাপানো, পিরিয়ডের ব্যবস্থা করা, শিক্ষক দেওয়া) করা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হবে না। মনে রাখতে হবে, শি-মাতৃশিক্ষাকে অনলাইন মডিউল করার কথা এঁদের চোখ এড়িয়ে গেছে। যেন অনলাইনে ভাষা শিখতে সময় দিতে হবে না।

এখানেই শেষ নয়। মাধ্যমিক স্তরে, অর্থাৎ উঁচু ক্লাসগুলিতে একটি ইংরেজি ভিন্ন 'বিদেশি' ভাষা শেখানোরও

সুপারিশ আছে, যার মধ্যে আছে কোরীয়, জাপানি, থাই, ফরাসি, জার্মান, স্প্যানিশ, পোর্তুগিজ রুশ। ভাষাগুলির তালিকাতে কোনও মাথামুন্ডু নেই। 'থাই' কেন, 'আরবি' কেন নয়, এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। সমিতিবাবুরা ভুলেই গেছেন বা জানেন না যে, ভাষা মানুষ শখ করে শেখে খুব কম, শেখে প্রয়োজনে। ব্যবহার না থাকলে শেখা ভাষা লোকে ভুলে যায়। কাজেই ভাষার একটা এলোমেলো তালিকা খাড়া করে দিলে সেটা হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। আরও মজার কথা হল, খসড়াতে 'চিনা' ছিল চিনের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হওয়ায় পরেরটাতে তা বাদ গেছে। শত্রুর ভাষাটাও যে শেখা দরকার শত্রুর মতলব বোঝার জন্য, তা এই সমিতির মনে হয়নি। ঐচ্ছিক হোক, আবশ্যিক হোক, মোট পাঁচটা ভাষা শেখার দায় ছাত্রছাত্রীদের উপর চেপেছে।

এ তো এক পাগলের কারবার। তারা বিষয় শিখবে কখন আর ভাষা শিখবে কখন? আগে প্রশ্ন তুলেছি—ভাষা শিখতে সময়ে লাগে না বুঝি? অনলাইনে হোক যেভাবেই হোক, তার জন্য সময় তো দিতে হবে ! আবার holistic, integrative, internationalized—ইত্যাদি অর্ন্তঃসারশূন্য ইংরেজি শব্দের পুনরাবৃত্তির জ্বালায় অস্থির হয়ে যাই। যেন আগের শিক্ষানেতারা এ সব নিয়ে কিছুই ভাবেননি। আগের শিক্ষাব্যবস্থা যেন এসব বিষয়ে নিরক্ষর ছিল!

আবার বলি ভাষা শেখে কোনও প্রয়োজনে তার ব্যবহার করা হবে বলে। শিক্ষায়, চাকরিতে (অনুবাদে, গবেষণায়, দোভাষীর কাজে, গোয়েন্দাগিরিতে, মুদ্রণ আর বৈদ্যুতিন সাংবাদিকতায়) ব্যবহার করতে পারবে বলে। কাজেই কে কোন ভাষা শিখবে তা সে নিজেই বাজর যাচাই করে ঠিক করে। এখানে নীতিপ্রণেতারা যে তালিকা করে দিয়েছেন তা হাস্যকর বললে কম বলা হয়।

৬. উপসংহার

আবার এ বিষয়ে জিজ্ঞাসু পাঠকদের এ নিবন্ধের ৩ ও ৪ অংশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ভারতের এই নতুন শিক্ষানীতি গৃহীত হবে কি হবে না, হলে তার রূপায়ণ কীভাবে হবে সে সব প্রশ্ন আমাদের আলোচনায় আপাতত অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু যে বিষয়টি বাঙালি শিক্ষাবিদদের আলোচনা করতে হবে তা হল শিক্ষায় মাতৃভাষার স্বরূপ কী, এবং তার চেয়েও বড় কথা—ভারত ও বাংলাদেশের শিশুদের সার্বিক শিক্ষায় মাতৃভাষার (অর্থাৎ শি-মাতৃভাষার) ভূমিকাতে কি স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে, না কি তাকে আমরা ধাপে ধাপে প্রসারিত ও ঊর্ধ্বমুখী করার দিকে অগ্রসর হব, ইংরেজির ভূমিকাকে লঘু না করে। অন্যান্য ভাষাও বাঙালি শিশু নিশ্চয় শিখবে, দরকার হলে তার জন্য দুই বাংলার শিক্ষাবিদদের একত্র হওয়া দরকার।

টীকা

১. সম্প্রতি কাগজে দেখলাম ভারতে চিকিৎসাবিজ্ঞান আর প্রযুক্তি মাতৃভাষার মাধ্যমে শেখানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। তা যদি সত্য হয়, তা একটি বিপুল অগ্রগতির পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হবে। আবার পাশাপাশি কলকাতায় সরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের খবরও দেখতে পাই।

২. প্রাথমিক একটি বিবরণের জন্য এই লেখকের *ভাষা দেশ কাল* বইয়ের 'শিশুর প্রথম ভাষা শিক্ষা' ও অন্যান্য কিছু প্রবন্ধ দেখা যেতে পারে। ২০০৫, দ্বিতীয় সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পৃ. ১৮০-১৮৯। তাতে বিদেশি Psycholinguistics এর বইয়ের উল্লেখ আছে, এই লেখকের কথা বিশ্বাস না করলে পাঠক সে বইগুলিও দেখতে পারেন। এখানে সেগুলির উৎস দেখানো হল না।

৩. নামটা চমস্কির Language Acquisition Device (LAD) থেকে নেওয়া। এই কায়দাটা চমস্কির মতে সব স্বাভাবিক মানুষের আছে, এবং শুধু মানুষেরই আছে, আর কোনও প্রাণীর নেই— তা হল একটা বা একাধিক ভাষা শেখার ক্ষমতা।

উৎসনির্দেশ

সরকার, পবিত্র ২০০৫, ভাষা দেশ কাল, ২য় সং, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ

২০১৩, চমস্কি, ব্যাকরণ ও বাংলা বানান, কলকাতা, পুনশ্চ।

Ministry of Human Resource Development 2019, Draft National Education Policy 2019, New Delhi, Government of India.

...2020, National Education Policy 2020, New Delhi, Government of india. Wikipedia, Literacy in India.